অস্ত সবিতার ছায়ারা

বাণী দত্ত

যারা যোগ্য হয়েও মর্যাদা পায় না। রাষ্ট্র যাদেরকে
নির্দয় নিপীড়ন করে, সেই স্তিমিত সূর্যগুলির প্রতি।

জীবন ছাড়া সাহিত্য হয় না। এটা এক জীবনেরই গল্প।

নিবারণের প্রত্যাবর্তন

দিঘিচক। পশ্চিমবঙ্গের অগণিত গ্রামগুলির মধ্যে একটি। উনিশশো সাতানব্বই-এর ঘোর গ্রীষ্মের দুপুরে এক ভদ্রলোক হন্‌হন্ করে হেঁটে গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার দু'ধারে একটি ডোবা ও পুকুর। একদল হাঁস ডোবাতে আংশিক মধ্যাহ্ ভোজ সেরে হেলে দুলে পুকুরের দিকে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের যাত্রাপথে ক্ষণিকের বিরতি এলো। কোষকষায়িত চোখে হাতের ছাতাটি হাঁসগুলির দিকে উঁচিয়ে ধরলেন। অনভ্যস্ত তাড়নায় হাঁসগুলি হংসনাদ করে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নেহাৎ মনুষ্যেতর জীব; তাই ভদ্রালোক অস্ফুটে কিছু একটা বলে আপনপথে এগোতে থাকলেন। পুকুরের অনতিদূরেই মন্দির। মন্দির সংলগ্ন একটি মাঠ আছে। সেখানে মেলা বসে। মন্দির প্রাঙ্গনে কুয়োতে গিয়ে দেখলেন জল অনেক নিচে। বালতি নামিয়ে জল তুলে হাতমুখ ধুলেন। তারপর বিগ্রহের সামনে গিয়ে প্রণাম করে করজোড়ে কিছু কথা উচচারণ করেই বললেন। তীব্র দহনের বৈশাখী দুপুর। চারদিক শুনশান। ভদ্রলোক ছাড়া এক ছাগল দম্পতি ও এক বুড়ো কুকুর নিদ্রামগ্ন হয়ে পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনের সাক্ষ্য বহন করছে। অতএব ভদ্রলোক কী বললেন তার শ্রোতা আর কেউ রইলো না।
হার দোকান তখনও খোলা। হা মুদি। একটু রোগা, সুন্দর চেহারা। নাপিতের ছেলে। নিজে আর নাপিতগিরি করে না। মুদির দোকান দিয়েছে। সদালাপী ও পরোপকারী। কবিগানও করে। কবিয়াল আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। তাৎক্ষণিক ছড়া কেটে বা গান বেঁধে আসর মাৎ করাবার লোক এখন খুবই কম। তবু হা বিবিধ বইপত্তর পড়ে। সেদিন হা আপন মনে খবরের কাগজ পড়ছিলো। ভদ্রলোকের পায়ের শব্দে সচকিত হোল। কী মাস্টারমশাই, এই রোদে কোথা থেকে ফিরলেন — একটু বসে যান। মাস্টারমশাই মুহূর্তের জন্য থামলেন। তারপর হার দিকে অগ্নিবর্ষণ করে আবার এগোলেন। কিছু পরেই তাঁর বাড়ি। হা ব্যথিত হয়ে বসে রইলো। এরকম তো হবার কথা নয় ! চত্রবর্তী স্যারের কী হোল? একে হা তাঁর পুরাতন ছাত্র। তারপর ব্যবসাসূত্রে তাঁর সঙ্গে যুক্ত। মাসের প্রথমে মালপত্র দিয়ে আসে। মাস্টারমশাই পাই পয়সাটি মিটিয়ে দেন। পুরাতন ছাত্রের কবিগানের ঝোঁক দেখে গানের বিষয় নিয়ে পরামর্শও দেন। সেই স্যারের আজ কী হোল?

চত্রবর্তী বাড়িতে সেদিন থমথমে পরিবেশ। চতুর্থ কন্যা নিঃশব্দে বাবাকে হাওয়া করছে। বাকি মেয়েরা ও ছেলে নির্বাক। চত্রবর্তী গৃহিণী মালতী এক গ্লাস শরবৎ দিয়ে স্বামীকে মুখঝামটা দিচ্ছেন ----
—অতো ঘেমে নেয়ে আসার দরকার কী ছিলো? মেয়ে কথা শোনেনি সে তো তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। আমি তো বারণই করেছিলাম তখন। গরিবের কথা বাসি হলে সত্যি হয়।
—থামো। নিবারণ চত্রবর্তীও কাউকে ছাড়ার পাত্র নয়। সে আমার ছেলেই হোক, কী মেয়েই হোক!
—সে তো বটেই। আর সুজাতা তো তোমারই মেয়ে !
—ও নাম আমার সামনে উচচারণ করবে না। ও সু নয়, ও কু জাতা।
—তা হলে তো গালাগালিটা আগে আমার প্রাপ্য। কারণ আমি গর্ভে ধরেছি। আর পরে তোমার, কারণ তুমি তার বাবা।

ব্রাহ্মণ তর্কে পরাজিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। তারপর স্ত্রীর দেওয়া শরবৎটি শেষ করে ঘরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন।
নিবারণ চক্রবর্তী গ্রামের হাইস্কুলের হেডমাস্টার। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আটটি সন্তানের পিতা। সাতটি কন্যা ও একটি পুত্র। ঈশ্বরের মহিমায় প্রথমটি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, বাকিগুলি স্বাভাবিক। একজনকেই পাত্রস্থ করতে পেরেছেন। বিয়ের একবছরের মধ্যেই তিনি কন্যা-হারা হলেন। রান্নার সময় স্টোভ ফেটে তার মৃত্যু হয় । পরের জন সুজাতা। জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রতি বাবা মায়ের আশাটা বেশিই থাকে। সে তো জন্মলগ্নেই পিতামাতাকে নিরাশ করে বসে আছে। দ্বিতীয় কন্যার উপরই আশার গুভারটা ন্যস্ত ছিল। তার মৃত্যুর পর তাই যাবতীয় স্নেহ সুজাতার উপর পড়লো। বালিকা সুজাতা নিজের অজান্তেই বাব ামায়ের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ালো। গ্রামের মাঠেঘাটে দৌড়াদৌড়ি করে, পুকুরে ছিপ ফেলে এবং সাঁতার কেটে, আম-জাম-পেয়ারা গাছে স্বচ্ছন্দে লাঙ্গুলবিহীন বানরী হয়ে বড়ো হতে লাগলো। বাবার তত্ত্বাবধানে নিয়মিত বিদ্যাভ্যাস ও নিজের জিদে প্রাত্যহিক সঙ্গীতচর্চা করে বালিকা ত্রমে কিশোরী। একদিন মাধ্যমিকও পাশ করলো। উচচ মাধ্যমিকের পরে কলেজে ভর্তি হয়ে বি এ পরীক্ষা শেষ না করেই কোলকাতা চলে গেল নার্সিং পড়তে। পাশ করে মহকুমা হাসপাতালে চ াকরি নিলো। এখন সে চায় নিজের মনোমত পাত্র বিয়ে করতে। নিবারণ চক্রবর্তীর পরিচিত ছেলেই। ছেলে হিসাবে ভালে াই। কিন্তু অসবর্ণ। তাই এ বিয়েতে তিনি সম্মতি দিতে পারেন না। তাঁর পিতৃ পিতামহ যে আদর্শ নিয়ে আপন কন্যাদের নিজের জাতে বিয়ে দিয়েছেন, তিনি ও তাই চান। সারা জীবন ধরে তিনি নিজধর্ম পালন ও নিজ জাতে বিবাহের পক্ষপাতী। আত্মীয় স্বজনরা অনেকেই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভিন্নবর্ণের সঙ্গে নিজবর্ণের বিয়ে মেনে নিয়েছেন। নিবারণ তাঁদেরকে টিটকারি দিয়েছেন, তিরস্কার করেছেন। এমনকী জলস্পর্শও করেন না তাঁদের ঘরে। অনেকেই তাই বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে নিবারণকে এড়িয়ে চলেন। অথচ আজ তাঁরই মেয়ে ----
—স্যার ঘুমোলেন না কী? স্যার?
নিবারণ অর্ধনিমীলিত চোখে তাকালেন। হা এসেছে।
—আপনার কী হোল স্যার? শরীর খারাপ?
নিবারণ নিত্তর রইলেন। মালতী ভিতরে ছিলেন। হার কথা শুনে এ ঘরে ঢুকলেন।
—হবে আর কী হা ? তিপু চাক্‌রি পেয়েছে শুনেছ তো? এখন পাখা গজিয়েছে। এখন সে নিজের মতে বিয়ে করতে চায়। ব াবা মায়ের কথা একবার ভাবলো না! তোমার মাস্টারমশাইকে তো জানো? আমি যেতে বারণ করেছিলাম। তাও গেল। মেয়ে বাপের কথা শুনলো না।
হা হেসে ফেললো, —বলেন কী কাকিমা? তিপু বিয়ে করবে? কাকে? এতো ভালো খবর।
—তুমি আর জ্বালিও না বাপু। একেই মানুষটা তেতে পুড়ে এলো। এসব শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে।
—তা জ্বলুন। আমার উপরে রাগ করার পুরো অধিকার তাঁর আছে। তিপুকে আমিও তো কোলে পিঠে নিয়ে বেড়িয়েছি। আমাকে দাদা বলেই জানে। আমাকে দেখেই সে মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে শিখেছে। গান বাঁধতে শিখেছে। আমি স্যারের ক াছেই সব শুনতে চাই।
নিবারণ ঘুমোননি। হার প্রতি তাঁর স্নেহ দৌর্বল্য আছে। ছেলেটার মুখে চোখে এখনও ছেলেমানুষি সারল্য আছে।
—স্যার , কার উপরে রাগ করেছেন? তিপুর উপর? আপনি তাকে সুজাতা বলেই ডাকতেন। আমি তাকে কোলে নিয়ে বলেছিলাম ,
---স্যার, অতো বড়ো নাম ধরে ডাকে কেউ? ওর একটা ডাক নাম দিন। আপনি বলেছিলেন,— তুই দে না। বোনের একটা ডাক নাম রাখ। আমি তখনই নামকরণ করেছিলাম -- ‘তিপু’।
চক্রবর্তী একটু মেদুর হলেন। হা বলতে থাকলো,
—স্যার, সন্তান তো আপনারই। আপনি রাগ করলে চলবে কী করে?
—তা তুই কী বলতে চাস? যে মেয়েকে আমি এতো বড়ো করলাম। তার অবাধ্যতা মেনে নেবো? জাতে বিয়ের কথা ভ াবলে তাও ঠিক ছিলো। তাই বলে একেবারে অসবর্ণ! আমি মুখ দেখাবো কী করে?

—কী যে বলেন, স্যার, ওসব আবার আজকাল কেউ ভাবে না কী? তা, তিপু কাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে?
—কে আবার? মালতী,— তুমি চেনো। ওই কল্যাণ, কল্যাণময়।
—কল্যাণ, সে তো খুব ভালো ছেলে। সে তো আপনাদেরও খুব প্রিয়। কলেজ থেকে সদলবলে বহুবার এসেছে এ বাড়িতে। আমার সঙ্গে কতো গল্প করেছে। ওরা যে পরস্পরকে পছন্দ করে সেটাতো কোনদিন বুঝিনি। তবু কল্যাণের মতো ভালো ছেলেকে আপনাদের অপছন্দ কেন?
—কারণ সে কায়েত। বামুনের মেয়ের সঙ্গে কায়েতের ছেলের বিয়ে আমি মানতে পারি না। তুই আমাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করিস না। তুই বেরো। হা হাসতে লাগলো, স্যার, শিক্ষক পিতা সমান। আপনারই শিক্ষা, বেরোতে বললে বেরবো। কিন্তু আবার ঢুকবো। আমাকে সব ব্যাপারে আপনি সাহায্য করেন। আপনার কষ্টের দিনে আমি পাশে থাকবো না?

নিবারণ দ্রবীভূত! —তুই বল না বাবা, এ সব সহ্য করা যায়? কল্যাণ ভালো ছেলে। বন্ধুত্ব ছিলো, সেটা থাকলেই ভালো ছিলো। আমিতো মাস্টারি করছি সারা জীবন। এই গ্রামে থেকেও আমি বিশ্বাস করি ছেলেমেয়ে সহজভাবে মিশুক। কিন্তু তাই বলে বিয়ে?
—স্যার তাতে আপত্তি করবেন না। জাতে না হলেও সৎপাত্র। এতে কোন সন্দেহই নাই। কাকিমা একটু ভেবে দেখুন। তিপু তো আমারও বোন।
—না এ বিয়ে আমরা মানতে পারি না। মালতী দৃঢ়, —বাবা মায়ের অমতে বিয়ে করলে অমন মেয়ে চাই না আমাদের।
—আজকে আপনাদের মন ভালো নেই। আমি যাই। তবু দু'জনে ভেবে দেখুন। আমার মন বলছে তিপু সবদিক ভেবে চিন্তেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি সব দিক থেকে আপনাদের সঙ্গে আছি। থাকবো। কিন্তু আজন্ম যে মেয়েটা আমাকে দাদা বলে জানে, সে আপনাদের মন থেকে চলে যাবে, সেটাও আমি সইতে পারবো না।

সুজাতার দিনকাল

আজ সকাল থেকেই আকাশটা বিষণ্ণ। কাল সন্ধ্যা থেকেই টুকরো মেঘ আনাগোনা করছিলো। ডিউটি বেলা একটায়। অতএব সুজাতার তাড়া নেই। মন্দাক্রান্তা ছন্দ ওই মেঘগুলোর মতো। বৃষ্টি ঝরাবে তার কোন চিহ্ন নেই। যাতায়াত আছে, আসছে --- যাচ্ছে, গতিমন্দে মেলামেশা আছে।
সুজাতা চা নিয়ে বসলো। পরশুদিন কল্যাণ ছিলো। সন্ধ্যায় বাড়ি গেছে। আজ তার কোলকাতা যাবার কথা। হাইকোর্টের উকিলের সাথে কথা বলার দরকার আছে।
পরশু বাবা এসেছিলেন। সুজাতার শৈশবকাল থেকে একমাত্র আরাধ্য। কল্যাণের সঙ্গে বাবার দেখা হয়নি। ও চলে যাবার আধঘন্টা পরে বাবা আসেন।
দরজায় কড়া নাড়া শুনে সুজাতা জিজ্ঞাসা করেছিলো, — কে?
--- আমি নিবারণ চক্রবর্তী, গম্ভীর গলার উত্তর।
সুজাতা দরজা খুলে দেখলো বাবা। চোখ মুখ থমথমে, চেহারাতে শ্রান্তির লক্ষণ। আমি বাবা না বলে বলেছেন, আমি নিবারণ চক্রবর্তী।
--- বাবা! সুজাতা স্মিত হেসে ছাতা আর ব্যাগ নিতে গেল।
নিবারণ দিলেন না, --- তোমার তো হোস্টেলে থাকার কথা। তুমি কোয়ার্টার নিয়েছ কেন? অবিবাহিতা মেয়েদের তো কোয়ার্টার দেওয়ার কথা নয়।
--- বলছি, ভেতরে আসবেন তো?
--- না, আগে শুনবো, তারপর ঢুকবো।
--- আপনি কী বিশ্বাস করেন আপনার মেয়ে কোন অন্যায় করতে পারে?

--- এতদিন করতাম না। এখন করি। তোমার এত বড়ো স্পর্ধা হয়েছে তুমি হোস্টেল ছেড়ে কোয়ার্টার নিয়েছ। আমি জানি না পর্যন্ত। কানাঘুষো যা শুনছিলাম সবই সত্য দেখছি। আমার ভাবতে লজ্জা হয় তুমি আমার মেয়ে।
সুজাতা শান্ত, --- মেয়েকে বকার অধিকার সব বাবার আছে। আমাকে বকুন, তবে ভেতরে এসে। এই কমপ্লেক্সে আরও অনেকে থাকেন। আপনি বাইরে থেকে বকাবকি করলে তাঁদের অসুবিধা হবে।
নিপায় নিবারণ ঘরে ঢুকলেন। একটা সিগারেট ধরালেন।
--- শোন, তোমার কথা শুনে আমার প্রবৃত্তি হলে আমি এখানে থাকবো। না হলে বাইরে গিয়ে কোন হোটেলে থাকবো।
--- বাবা, আপনার মেয়ে এমন কিছু অস্পৃশ্য হয়নি যে আপনাকে অন্য জায়গায় থাকতে হবে।
--- আমি এ ঘরে ছেলেদের জামা দেখছি। তোমার কী ব্যাখ্যা আছে যে একটি মেয়ের ঘরে ছেলেদের জামাকাপড়। এটা কী কুৎসিত ব্যাপার নয়?
—বাবা, আমি আনম্যারেড নই। আমি বিয়ে করেছি। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। ওই জামাপ্যান্ট আপনার জামাই কল্যাণের।
--- কেউ আমার জামাই নয়। বাবা মা জানলো না, সন্তানের বিয়ে হয়ে গেল?
-- বাবা, আমি জানি এই কথাই আপনি বলবেন। তাই আপনাকে জানাই নি। একটু সময় নিয়ে জানাতাম। অপেক্ষা করছিলাম ওর একটা চাকরির জন্য।
--- ওই ছেলে চাক্‌রি পাবে? অতোই সোজা আজকাল চাকরি পাওয়া? ও তোমাকে কী খাওয়াবে? ওকেই তোমার পয়সায় খেতে হবে।
--- এতেই বা দোষের কী আছে? স্বামীর রোজগারে যদি স্ত্রীর লজ্জা না হয়, স্ত্রীর রোজগারে স্বামীর অসুবিধা কোথায়? একই রকম থাকবে চিরকাল? আমি আপনাকে একটা প্রণাম করবো বাবা? বিয়ের পর তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।
—না তোমার প্রণাম নিতে আমার চি হয় না। তুমি মা বাবার অমতে অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছো। তোমাকে আমার মেয়ে বলে ডাকতেও ঘৃণা হয়। তোমরা যাই ভাবো, আমি বলবো এটা ব্যভিচার।
সুজাতা কয়েক মুহূর্ত বাক্‌দ্ধ থাকলো। বাবার কাছে বাধা, তিরস্কার আসবেই, জা জানা ছিলো। তাই বলে এরকম কথা? নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, --- আমার প্রণাম নিতে হবে না। পায়ে হাত নাই বা দিলাম। আপনি আমার জন্মদাতা, সেটাতো আমি অস্বীকার করি না। মনে কন আপনি কোন পরিচিতি মানুষের বাড়িতে এসেছেন। ব্যাগ আর ছাতাটা রেখে হাত মুখ ধুয়ে নিন, স্নান কন।
নিজের কর্কশ উক্তি নিবারণ হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন। মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। ব্যাগ, ছাতা, মাটিতে রাখলেন। ব্যাগ খুলে একটি ধুতি ও গামছা বের করে বাথমে গেলেন।
সুজাতা একটু স্বস্তি পেয়ে চিনি, মিছরি আর এক গ্লাস জল টেবিলে রাখলো। বাবার কথা গায়ে না মাখার চেষ্টা করলো। বাবা তো ওইরকমই। নিজের ধ্যান ধারণা নিয়েই আছেন। জগৎটা যে ত্রমাগত বদলে যাচ্ছে, মানতেই চান না। অথচ নিজে শিক্ষক। সে তো জানতোই বাবা এ বিয়ে মেনে নেবেনা। কিন্তু তার কাছে তো এ বিয়ে সত্য, পরম পবিত্র। মা ও মেনে নেবে না। ভাই বোনেরা? তাদের কাছে তো সেজদি ভীষণ প্রিয়। শিপুকে মনে পড়ে খুব। তার পিঠোপিঠি বোন। গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলো বোধ হয়।
সে আর শিপু চুরি করে কুলের আচার খেতো। পাল্লা দিয়ে পুকুরে সাঁতার কাটতো। ছিপ ফেলে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা করতো। কে জানে তারা কী ভাবে আছে, কী ভাবছে? দাদাই বা কী করছে এখন? বাবা তো নিশ্চয়ই কিছু একটা খবর পেয়ে সবাইকে জানিয়েই এখানে এসেছেন। এর আগে অবধি হোস্টেলেই এসেছেন। এবার কোয়ার্টারে। ভাবতে পারেন নি যে মেয়েকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে দেখবেন। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে অবিবাহিতা মেয়েরা নার্সিং হোস্টেলে থাকবে, বিবাহিতা মেয়েরা পরিবারের সঙ্গে কোয়ার্টারে থাকবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিত্রম হয়। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করার পর সুজাতা ফ্যামিলি কোয়ার্টারের জন্য দরখাস্ত করেছিলো। পেয়েও গেছে।
নিবারণ বাথম থেকে বেরোলেন। চোখমুখ তখনও থমথমে। সুজাতা স্থির দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকালো। তারপর নম্রগলায় বললো, —চিনি, মিছরি জল রেখে দিয়েছি। শরবৎ খান। আপনি বললে আমি করে দেবো।
নিবারণ উত্তর দিলেন না। তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্তও। নিজেই এক গ্লাস শরবৎ করে খেলেন। সুজাতা এর মধ্যে দুটো আম ধুয়ে

দিলো। নিজেই সে দুটো কেটে খেলেন। যুদ্ধ শু হোল আবার।
--- আমি সব ভুলে যেতে পারি, তুমি যদি এই পুতুলখেলা ভুলতে পারো।
--- আপনার কাছে যা পুতুলখেলা মনে হচ্ছে, আমার কাছে তা ধ্রুবসত্য। আমি বালিকা নই। বোঝার বয়স হয়েছে। বিয়ে একটা পবিত্র বন্ধন। আমি সেই পবিত্রতাকে স্বীকার করি। তাকে অসম্মান করতে পারি না।
--- তাই বলে তুই বামুনের মেয়ে হয়ে এক কায়েতকে বিয়ে করবি?
-- বাবা, আপনি ছোটবেলায় জবালার গল্প বলতেন না। ছেলের পিতৃ পরিচয় ছিলো না। আশ্রমে পড়তে গিয়েছিলো। সত্যকামকে পিতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে বলতে পারে নি। মায়ের কাছে জেনে এসে গুদেব গৌতমকে বলেছিলো যে তার গোত্র নাই। অন্যান্য শিষ্যরা অবাক হয়, পরিহাস করে, কেউ কেউ রেগেও যায়। ব্রাহ্মণ ছাড়া ওই শিক্ষাশ্রমে আর কারও পড়ার অধিকার ছিলো না। কিন্তু তার সত্য কথায় গু তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন তুমি তো অব্রাহ্মণ নও, তুমি দ্বিজোত্তম। তুমি সত্যকুল জাত।
--- তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? ওটা তো উপনিষদের গল্প।
--- কল্যাণকে তো বহুদিন ধরে জানেন। তার উদাহরণ দেখিয়ে সবাইকে উৎসাহ দিতেন। সে কায়স্থ। বামুনের ঘরে তার মতো ছেলে কী প্রচুর পাওয়া যায়?
--- তর্ক করো না, ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হয়েছে বেদের আমল থেকে। তার সঙ্গে কায়স্থের কোন তুলনাই হয় না। ব্রাহ্মণ ছাড়া সবাই অনার্য।
সুজাতা একটু হাসলো। --- বাবা, আমিও নিবারণ চক্রবর্তীর মেয়ে। গ্র্যাজুয়েশন শেষ না করে নার্সিং পড়তে গিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু পরে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট্ করার সময় সব সুদে আসলে পুষিয়ে নিয়েছি। আপনি তো জানেন, প্রতি বেদে দুটি অংশ আছে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। বেদের যুগে ব্রাহ্মণ বলে কোন জাত ছিল না। মানুষই পরে কাজের সুবিধের জন্য বর্ণের সৃষ্টি করে। সেগুলোই তো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আমি যতটুকু জানি এই শূদ্ররা মোটেই অনার্য ছিলো না। বরং আজকালকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই অনার্যের কাজ করে।
নিবারণ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকলেন। অকাট্য যুক্তিজাল, সন্তানের কাছে পরাজয়ে অপ্রতিভতার সঙ্গে খুশিও হলেন বোধ হয়। মচ্কালেন, তবু ভাঙলেন না।
--- তুই ফিরে আয় মা।
--- আমি কি আপনাদের থেকে দূরে আছি? আপনারা কল্যাণকে মেনে নিন। তাকে জামাই বলে স্বীকার কন। আমিও জ্যেষ্ঠ সন্তানের মতো পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করবো।
--- সেটা হয় না।
—তা' হলে আমি ও আমার সত্যে অবিচল থাকবো।
--- তাই থাক তাহলে, নিবারণ খরবাক, —তুই যদি আমার কথা না শুনিস, আমিও তোকে মেয়ে বলে স্বীকার করবো না।
-- বাবা! সুজাতা সজল।
--- কোন কথা শুনতে চাই না। তোমাকে আজকের রাতটা ভাববার সময় দিলাম। তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। তাই আজ রাতটা তোমার কাছেই অন্নগ্রহণ করবো। তুমি যদি কাল সকালেই আমার সঙ্গে বাড়ি যেতে পারো, তা হলেই আমার মেয়ে বলে স্বীকৃতি পাবে। তা না হলে আজ রাতেই তোমার হাতে আমার শেষ অন্নগ্রহণ।
সুজাতা স্তম্ভিত চোখে মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। বাবাকে একটা চেয়ার ও খবরের কাগজ এগিয়ে দিলো। টিভিটা চালিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে গেল। বাবা এটা তুমি কী বললে! বিয়ে মেনে নিতে পারছো না, তাই বলে নিজের মেয়েকে অস্বীকার! কল্যাণ এসব কথা শুনলে কী বলবে কে জানে? হয়তো বলবে তুমি বাবার কাছে ক'দিন গিয়ে থাকো। সে তো জানে তাতে কোন লাভ নেই। বাবার মতের অনুসারী না হলে ওই গোঁ ভাঙানো যাবে না।
--- এগুলো খেয়ে নিন।
নিবারণ দেখলেন মেয়ে টোস্ট, চা ও ওমলেট এনেছে।

--- তুমি এসব করতে গেলে কেন? ভাতে ভাত করে দিলেই তো হতো!
--- রান্না করতে তো সময় লাগবেই। আপনি অনেকক্ষণ খাননি। বাইরের খাবার তো খাননা। এগুলো খান। আমি ভাত চ াপাচ্ছি। ভাগ্যিস মর্ণিং ডিউটি ছিলো সেদিন। না হলে বাবার খুবই অসুবিধা হোত। কল্যাণ চলে গিয়েছিলো। দুপুরের যে খাবার ছিলো, তাই গরম করে রাতটা ম্যানেজ করে নেবে ভেবেছিলো সুজাতা। বাবার জন্য রান্না চাপালো। আর কে ানোদিন বাবাকে রান্না করে খাওয়াতে পারবে কি না জানে না। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ পাচক হচ্ছে পুষেরা। কিন্তু গৃহকোণে মেয়েরাই প্রধান। রান্নায় খুব পারদর্শিনী না হলেও বাবার জন্য যেন অন্তরের সব সুধাটুকু ঢেলে সে রান্না করতে লাগলে া। সুজাতার বিশেষণ মেয়েরা তিনটি ক্ষেত্রে রান্নায় বিশেষ মনযোগী হয়। বাবার জন্য, স্বামীর জন্য, সন্তানের জন্য ও পরে জামাইয়ের জন্য। সেদিন বাবার জন্য হয়তো বা শেষ সুযোগ সে পেয়েছিলো। রান্নার মাঝে একবার দেখলো বাবা খবরের কাগজ পড়া শেষ করে নিবিষ্ট মনে টিভি দেখছেন।
রান্না শেষ করে পিতাপুত্রী দুজনেই খেয়ে নিলো। খাওয়ার সময় বাবা আর কথা বললেন না। সুজাতা বিছানা করে দিলে া।
—তুমি কিছু না বললেও তোমার ইচ্ছে আমি বুঝতে পারছি। তুমি কিছুই গোছগাছ করনি।
--- আপনার কাছে যেটা সঠিক মনে হচ্ছে, আপনি তাতেই স্থির। আপনার মনে হয় না আমার কাছে যেটা সঠিক আমার তাই করা উচিত?
—আমি যখন তোমাকে বলেছি, তুমি আজ রাতটা ভাবো।
বাবা বিছানায় গেলেন। সুজাতাও টুকিটাকি কিছু কাজ সেরে শুয়ে পড়লো। অন্যদিন কল্যাণের চিন্তায় ঘুম আসতে দেরি হয়। আজ কিন্তু মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি অনুভব করলো। পিতা তাঁর আত্মজাকে টলাতে পারেন নি। সে কিন্তু তার সত্যে অবিচল।
পরদিন ভোরেই ঘুমকাতুরে সুজাতার ঘুম ভাঙলো। দেখলো বাবা যাওয়ার জন্য তৈরি। ঘনঘন সিগারেট টান দিচ্ছেন। স ারারাত ভালো ঘুম হয়নি মনে হল। সুজাতা বাবাকে প্রণাম করতে গেলো। বাবা এক পা পিছিয়ে গেলেন। সুজাতা বাবার পা রাখার জায়গার ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালো। বাবা নিঃশব্দে ছাতা ও ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সুজাতা এক টুকরো কাগজে বাবার সিগারেটের ছাই মুড়ে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে আলমারিতে রাখলো। এটা গতকালের ঘটনা। ওদিন ও সুজাতার মর্নিং ডিউটি। মনের মধ্যে ঝড় থাকলেও কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ডিউটি করে গেল। টিফিন করতে আস ার সময় একবার যেন মুহূর্তের জন্যে দেখলো বাবার মতো কেউ খুব জোরে স্টেশনের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। ডিউটি করে আসার পর থেকেই বিভিন্ন তির্যক ঝোপ থেকে শুনলো সকালবেলার ঝড়ের সংবাদ। বাবা তাঁর কোয়ার্টার থেকে বেরোব ার পরই নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে যান। তাঁকে রীতিমত চার্জ করেন যে কেন তাঁর মেয়েকে ফ্যামিলি কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে। এতে তাঁর মেয়ের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। নার্সিং সুপার তাঁকে হাসপাতাল সুপারের কাছে পাঠান। সেখানে গিয়ে তিনি একই অভিযোগ জানান। সুপার জানান যে তাঁর স্টাফ তাঁকে বিবাহিতা বলে জানিয়েছেন। এবং সঠিক প্রথায় কোয়ার্টার পেয়েছেন। বাবা তাঁকে কেস করার ভয় দেখান। তিনি বাবাকে হাঁকড়ে তাড়ান। কয়েকজন সিনিয়র ডাক্তারের কাছেও বাবা অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের অপারগতার কথা জানালে বাবা স্থানত্যাগ করেন।
প্রাথমিক সংকোচের দণ সুজাতা নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এবং মিনিট পনেরোর মধ্যেই নিজেকে সামলে নেয়। অর্পিতা গতক াল বিকালে এসেছিলো। সে এসে তড়পালো মেসোমশাই যখন এসে ছিলেন, তাকে তখন ডাকা হয়নি কেন? অর্পিতা সুজ াতার ফ্যান। মাঝে মধ্যেই আবদার করে দিদি গান শোনাও। এক বছরের জুনিয়র। নিজেও ধর্মসংগীত গাইতে পারে। তার আর কল্যাণের কথা সে জানে। অর্পিতার সঙ্গে গল্প করে সে কিছুটা হালকা হয়। গত সন্ধ্যায় মাস্টারমশাই এসেছিলেন। বৃদ্ধ অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। তার নিজের গান লেখার অভ্যাস আছে। মাস্টারমশাই সেগুলোতে সুর দেন। তাঁর কাছে রবীন্দ্রসংগীত শেখে। সামনেই থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা। রাতটা কেটে গেল।
চা শেষ করে সুজাতা রান্নায় গেল। কতো কথা জমে আছে। কল্যাণ রাত্রে আসবে। ওকে সব না বললে তার স্বস্তি হচ্ছে ন া।
কল্যাণ! কল্যাণ তার জীবনের স্বপ্ন, তার প্রত্যয়, তার জীবনের সংকল্প। একেবারেই গ্রামের মেয়ে। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম।

কেউ ভাবতেই পারে না তার মতো মেয়ে কারও প্রেমে পড়বে। কী করে যে কী হোল, কে জানে? কল্যাণ বয়সে তার থেকে একবছরের বড়ো হলেও সে ছিলো একসময়ের সহপাঠী। সুজাতার দাদার সঙ্গে কল্যাণের প্রথম ভাব হয়। তারপরে তার সাথে। হৈ-হুল্লোর, আলোচনা এসব নিয়েই দিন কাটাছিলো। কিন্তু প্রেম? এতো সতীর্থদের মধ্যে তাকেই যেন কী করে ভ ালো লাগলো।

যুগে যুগে নারীরা বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয়স্থল খোঁজে। সেই অবলম্বন পেলে তারা আর কিছুই চায় না। কল্যাণের মধ্যে সুজাত া সেই নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছিলো। তাই তার কাছে আর সব কিছু গৌণ হয়ে গেল।

আজও মাঝে মাঝেই হাসি পায়। অন্যান্য অগণিত মেয়েদের মধ্যে সেও জানতো গ্র্যাজুয়েট হলেই বাবা তার বিয়ে দেবেন। কোন ছেলে যাতে আকৃষ্ট না হয়, সে জন্য সে খুব সাধারণ ভাবে থাকতো। সাজগোজ করতোই না। তবু তার সহপাঠী তপন অন্য একজনের মাধ্যমে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার প্রস্তাব পাঠায়। সুজাতা প্রস্তাবটা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ সে বেচারার কাছে যায়। তপন তখন অন্যান্য বন্ধুর সাথে গল্প করছিলো। সেখানে গিয়ে সবার সামনে সে সটান জানায়, — শোন তপন, তোর প্রস্তাব পেয়েছি। ওটা গ্রহণযোগ্য নয়। তোর সঙ্গে আমি প্রেম করবো না। আমাকে ঘাঁটাবি না।

এ ঝড়ের পরে শুধু তপন কেন? কেউ তার কাছে ঘেঁষতো না।

সেই সুজাতাও প্রেমে পড়লো!

কল্যাণের সত্যসন্ধান

কল্যাণ রাত্রির ট্রেনে ফিরছে। ভোরের ট্রেনে কোলকাতা গিয়েছিলো। সকাল থেকে বিকেল অবধি উকিলবাবুর পিছনেই সময়টা কাটলো। সকালে সাড়ে আটটা নাগাদ উকিলের বাড়ি গিয়েছিলো। উকিলবাবু সুধাংশু মল্লিক তখন খেতে বসেছেন। অভুক্ত কল্যাণ পরিচয় দিয়ে খবর পাঠালো। তিনি অপেক্ষা করতে বললেন। কল্যাণ বাইরে একটা চায়ের দোক ানে চা ও পাঁউটি খেয়ে এলো। উকিলবাবু এলেন।

--- কী ব্যাপার?

--- স্যার, আমার সেই ইনটারভিউটা তো হয়নি। ডি আই মানছেন না।

---- আরে ইন্টারভিউ বললেই হয়? কোন কেসটা বলতো? কাগজপত্র কই?

কল্যাণ কোর্টের একটা অর্ডার দেখালো।

তার বাড়ির কাছেই একটা স্কুল আছে। গ্রামের এই স্কুলে সেও এককালে পড়েছে। মাস্টারি করার বাসনায় এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জে নাম লিখিয়েছিল। নাম ওঠাতেই সার্ভিস চার্জ মাত্র বিশ হাজার। এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জ থেকেই ফিস্‌ফাস অ াওয়াজ শুনেছিলো সরকার নাকি স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরি করবে। তখনতো গোটা ব্যপারটাই কলেজ সার্ভিস কমিশনের মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ যোগ্য ব্যক্তিই চাক্‌রি পাবে ! সব কমিশনেই কর্তাভজা লোকজন থাকে। অতএব? অতএব কিছু দিতে হয়। অবশ্য কথার খেলাপ তাঁরা করেননি। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে তার নামটাও স্কুলে পাঠানো হয়। আশা করেছিলো তার ইনটারভিউটা নেওয়া হবে। কোয়ালিফিকেশন্‌স, আছে। এম এ করেছে, বি এড এ পাশ করেছে। স্কুল মাস্টারির জন্যে যথেষ্ট। তবে স্কুলে গিয়ে হতাশ হোল। সেখানে শুনলো যে সরকারি ফরমান আসছে এবার থেকে সর াসরি স্কুল সার্ভিস কমিশন মারফৎ শিক্ষক নিয়োগ হবে। হিসেব করে দেখলো যে তার এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জের কাগজপত্র সরকারি ফরমানের আগেই বেরিয়েছে। একজন বেকার যুবক সাধারণভাবে হাল ছেড়ে দেয় এই পরিস্থিতিতে। রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণের কাছে সাধারণ মানুষ বড়ো অসহায়। আধুনিক রাষ্ট্রশক্তি একটি যূথবদ্ধ যন্ত্র, নিপীড়নের সমস্ত আয়ুধ সমন্বিত। সেখানে একাকী ব্যতিক্রমী মানুষ তার যাবতীয় পরাক্রম সত্ত্বেও শোষিত হয়, নির্যাতিত হয়। রাষ্ট্রের নিয়ামকদের ব্যক্তিগত আক্রোশও সেখানে রাষ্ট্রশক্তির নামেই চালিত হয়। এই একটি ব্যাপারে অন্ততঃ রঙের কোন ভেদাভেদ নেই। অতএব সিস্টেমের প্রতি যথেষ্ট হতাশ ও নৈরাশ্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও কল্যাণ হাইকোর্টে গেল। এক পরিচিত ব্যক্তির সূত্র ধরে এই উকিলকে ধরলো এবং তারপর কোর্ট থেকে অর্ডার বেরলো স্কুল যেন ইনটারভিউ নেয়।

উকিলবাবু তার কাগজটি পড়লেন।

--- তাই বলো! এবার মনে পড়েছে। তা তোমার ইনটারভিউ হয়নি?
--- না স্যার,
---- কেন?
---- স্কুল বলছে এখন স্কুল সার্ভিস কমিশনের ক্যান্ডিডেট নিতে হবে। এভাবে ইনটারভিউ নেওয়া যাবে না। ওরা স্কুল কমিটি ডিজলভ্ করে দিয়েছে।
---- তাতে কী হোল। নতূন কমিটি করে ইনটারভিউ নিলেই হয়।
--- সে তো হয়ই স্যার। কিন্তু তা তো করবে না। কিছু মাতববর, তো থাকেই সব জায়গা। তারাই কলকাঠি নাড়ে। গভর্নমেন্ট সার্কুলার আসার আগেই কমিটি ডিজল্ভড্ হয়ে গেল। তাছাড়া জানেনইতো স্যার, টাকা ছাড়া মাস্টারি প াওয়া যায় না। কোর্টের অর্ডারে আমার ইনটারভিউ নিলে টাকা না ও পাওয়া যেতে পারে; অবশ্য আমি যদি সিলেক্টেড হই। তাই কমিটিকে হাওয়া করে দেওয়া হোল। ইতিমধ্যে আমি এস এসসির পরীক্ষাও দিয়েছি। রেজাল্ট বেরোবে এব ার।
“তো, তুমি কী করতে বলো? কন্টেম্পট্ করবে?”
“আপনি যে রকম পরামর্শ দেন।”
“আরে সেও তো টাকার ব্যাপার। তুমি বেকার ছেলে। টাকা কোথায় পাবে? আগের বারই তো কতো টেনে টুনে তোম ার অর্ডারটা বের করে দিয়েছি। নেহাত তুমি বামাপদবাবুর সুপারিশ নিয়ে এসেছিলে। মনে আছে?
মনে তো আছেই। বামাপদবাবু ওই স্কুলের সেক্রেটারি। কল্যাণকে ছোট থেকেই ভালোবাসেন। যে বাড়িতে লেখাপড়াটা ব াহুল্যমাত্র, সেই বাড়ি থেকে একটি ছেলে এমএ, বি-এড করেছে; এই ব্যাপারটা তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। তিনি মনে প্রাণে চ াইতেন এই ছেলেটি তার নিজের স্কুলেই মাস্টারি কক। তিনি কল্যাণের আদর্শের কথা শুনেছিলেন।
কল্যাণ তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে মানুষগড়ার কারিগর হতে চেয়েছিল। এবং মনে আছে বৈ কী! উকিলবাবু শুনিয়েছিলেন অর্ডার বের করা এমন কিছু ব্যাপার নয়। কেস তো কল্যাণের পক্ষেই যাবে। তাঁর আর ফিস্ কতটুকু? বাম াপদবাবুর কাছ থেকে যখন এসেছে তখন প্রায় বিনাপয়সাতেই করে দেবেন। কিন্তু কোর্টের যে শতেক খাঁই। তিনপাতা ট াইপ করতেই পঞ্চাশ টাকা নেবে। মুহুরি নেবে, আর্দালি নেবে। একটু জটিল কেস, তাই একজন সিনিয়রকে মিনিট পাঁচেক দাঁড়াতে হবে। এমনিতে তাঁর ফিস্ চার হাজার টাকা। তো, আমি সেটা ম্যানেজ করে নেব। তারপর এই একটু সহ ানুভূতিশীল বিচারকের এজলাশ ছাড়া এ কেস করা উচিত নয়। সেখানেও—। সব মিলিয়ে মাত্র হাজার পাঁচেক। ন্যায় বিচার চাইতে এ খরচ মাত্র তিল প্রমাণ।
--- স্যার, কন্টেমপ্ট করতে খরচ কেমন?
--- হাজার বারো পড়বে। আপাতত চারহাজার দাও। কাগজপত্র রেডি করি। একটা উকিলের চিঠি দিই তোমাদের স্কুলে। তাতে কাজ না হলে কন্টেমপ্ট।
কল্যাণ হাজার পাঁচেক নিয়ে এসেছিলো আগের হিসাব অনুযায়ী। চার হাজার গুণে দিলো। হাতে ন'শো মত থাকলো।
--- আমি রেডি হই। তুমি মিনিট পনের বাদে একটা ট্যাক্সি ডাকো।
এটা আগের বারে লাগেনি। গরজ বড়ো বানাই। সাড়ে এগারোটা নাগাদ কোর্টে গিয়ে তাকে এক জায়গায় দাঁড়াতে বলে ভিতরে গেলেন। কল্যাণ ঘুরঘুর করতে লাগেলা। চাকাহীন রিক্সায় চা খেলো। রিক্সা অর্থাৎ রিক্সার ধাঁচা। এস্টা ব্লিশড্ দোকান নয়। সরকারকে কিছু দেওয়ার দায় নাই। শুধু পার্টি ফিট্ থাকলেই হোল। উকিলবাবু কখন চলে আসবেন কে জানে? চোয়াড়ে চেহারার দু'চারজন মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। কোন ঝামেলা থাকলে সিওর সাক্সেস এর প্রতিশ্রুতি দিলো। কল্যাণ দালাল বুঝতে শিখেছে। ঘন্টা তিনেক বাদে উকিলবাবু ফিরলেন।
--- আমার কয়েকটা কেস ছিলো। ওগুলোর ঝামেলা চুকলো। আদালত বড় নচ্ছার জায়গা হে। সব সময় খাই খাই। স াধারণ লোকে এতো খিধে কী করে মেটাবে বলো তো? ভালো লাগে না। নেহাৎই পেটের দায়ে --- ।আরে তোমার তো খাওয়াই হয়নি। চলো ক্যান্টিনে যাই। কোর্ট তো! দামটা একটু বেশিই নেয়। কিন্তু খাবার গুলো ভালো।
অগত্যা! কল্যাণ পকেট আর একটু হালকা করে একটু লঘু হোল। দুঃখ পাবার বদলে তার পেট থেকে কুলকুল করে হা

সি বেরিয়ে আসছিলো। এ রকম দুষ্প্রাপ্য জ্ঞানপাপী দেখে সে বেশ পুলকিত হোল।

—জানো, আমার ছেলেকে আমি ওকালতি পড়াবো না। এ বড়ো হীন কাজ। ফুল চান্সে কেস তুমি জিতবেই। সময় লাগে। সময় লাগলেই উকিলদের ইন্‌কাম। হাফ চান্সেও জিততে পারো। তবে তার জন্য সঠিক এজলাসটি জানতে হবে। চারিদিকে টাউট ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই দেখো, ওই যে লোকটা ওখানে খাচ্ছে, ওটাও একটা টাউট। গোঁফটা দেখছো না। আর ওর সঙ্গের ওই লোকটা --- ! বিচার চাইতে এসেছে বোধহয়। ওকে ছিবড়ে করে দেবে। আরে বোকা, টাকাই যদি দিবি, উকিলদের দে ! তাদের কিছু দয়ামায়া থাকে! কী বলো ?

—হ্যাঁ, স্যার। তা তো বটেই !

—শোন। আমি যাচ্ছি। ঘন্টা খানেক বাদেই আসছি। তুমি এখানেই বসো। দরকার হলে আর একবার চা খেও। দেখো, কারও পাল্লায় পড়ো না যেন।

—না স্যার।

কল্যাণ চুপচাপ বসে থাকলো। বিবিধ লোকের আনাগোনা দেখতে লাগলো। এ এক বিচিত্র জায়গা। ফিস ফিস করে আলোচনা, চোখের জল, হাসি, হুঙ্কার, টাকা পয়সার লেনদেন। কখনো টাউট, কখনো কালো কোট সাদা প্যান্টের পিছনে বিচার ভিখারির দল। একদল ধূর্ত শেয়াল, আর তাদের পেছনে হাঁসের দল প্যাঁক প্যাঁক করছে খাদ্য হওয়ার জন্য।

এক ভদ্রলোক এসে বসলেন। চা আর টোস্ট চাইলেন। দেখেই বোঝা যায় মফঃস্বল থেকে এসেছেন।

—কী দাদা, কেস্ টেস্ আছে না কী? কল্যাণ জিজ্ঞাসু।

ভদ্রলোক সঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইলেন,

—আপনি?

—আমি ও বিচার চাইতে এসেছি।

—তাই বলুন। আমি ভাবলাম। কাউকে বিশ্বাস করা মুস্কিল, বুঝলেন না। আপনার সমস্যাটা কী?

—স্কুলে চাক্‌রি চাইতে গিয়েছিলাম। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের চিঠি নিয়ে। ইনটারভিউ নিল না। কোর্টের অর্ডার আছে। তবুও না। উকিল বলছেন কন্‌টেমপ্‌ট অফ্ কোর্ট করতে হবে। আপনারটা ?

—আর বলবেন না। জ্ঞাতিরা জমি দখল করে নিয়েছে। আমি আদালত করলাম। টাকার নয়ছয়। কেস জিতেও জমির দখল নিতে পারলাম না। ঝান্ডা পুঁতে দিয়েছে। পুলিশ সাহায্য করছে না। উকিল বলছেন পলিটিক্যাল কেউ লাগলে সুবিধা হবে না। অভিমন্যুবাবু আপনি রফা করে নিন। রফাই যদি করবো, তাহলে এতগুলো টাকা খরচ করলাম কেন? আর আইন আদালতের নামে ফচ্‌কেমিই বা হচ্ছে কেন? আমার উকিলকে দেখলাম ওদের পক্ষের উকিলের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করতে। এখন তিনি হাওয়া। বাড়িও চিনি না যে ---।

—সে কী ?

—আর বলেন কেন? এখন আমি কী করি ? উকিলের বিদ্ধে কেস করবো ? কোন উকিল দাঁড়াবে না। কাক কাকের মাংস খায় না। কনজিউমার প্রোটেক্‌শন্ অ্যাক্টে তো তাদের জড়ানো যাবে না। আমি চাই উকিল পুলিশ প্রোটেক্‌শনের ব্যবস্থা কক, আমি দখল নিই। কোর্টের কড়কানি ছাড়া পুলিশকে নড়ানো যাবে না। কিন্তু এখন উকিলই তো সরে পড়েছে। আমার মনে হয় মক্কেলের স্বার্থ না দেখে যে উকিল সরে পড়ে তার বিদ্ধে কনজিউমার কোর্টে কেস করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। শুধু তাই বা কেন, যে মানুষ ন্যায়ের পথে আছে, তাকে ন্যায়ের বিচার দিতে পারে না যে বিচারক, তাঁকেও কনজিউমার কোর্টে দাখিল করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। গণতন্ত্র বলতে এটাই বোঝায়।

—সবেবানাশ। এযে বিপ্লবাত্মক কথাবার্তা। তা আপনি কী করেন দাদা ?

—মফঃস্বলে একটা পেপার চালাই। আচ্ছা ! আপনার উকিলের ঠিকানাটা একটু দিন তো। আপনার ঠিকানাটাও দেবেন। তারপর আপনি বসুন। আমি আর একটু ঘুরে ফিরে দেখি। একবার বার কাউন্সিলেও যাবো। তবে আমি হতাশ।

কল্যাণ নিজের আর মল্লিকবাবুর ঠিকানা দিলো। ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, —আরে আমরা তো কাছাকাছিই থাকি। তাহলে দেখা হবে, চলি।

অভিমন্যু চলে গেলেন।

কল্যাণ আর একটা চায়ের অর্ডার দিলো। চায়ে একটা চুমুক দেওয়া মাত্রই দেখে তার উকিলের ভাষায় সেই টাউট তার মুখোমুখি বসলো, ওই মল্লিক আপনাকে কী বলছিলো মশাই? আমি টাউট, তাইতো? আরে মশাই, আমিও হাইকোর্টের উকিল। কালো কোটটায় গরমকালে কষ্ট হয়। তাই এজলাস ছাড়া পড়ি না। আমি উকিলদের মধ্যে একজন অ্যাক্টিভিস্ট বলতে পারেন। এলাহাবাদ কোর্টেও কাজ করেছি। মানুষকে শুষে নেওয়ার বিদ্ধে লড়াই করি। কোর্টের হাজারো প্যাঁচের বিদ্ধে আমি মুখ খুলি। আমি তো জানি আপনার কেসটা।

--- বলেন কী?

--- আপনার একটা স্কুলে ইনটারভিউ হওয়ার কথা ছিলো। ইনটারভিউ নেয় নি। ঠিক?

---- ব্যাপারটাই তাই।

--- আপনি কনটেম্পট্ করবেন , ঠিক?

--- হ্যাঁ ঠিক।

--- ও প্রথমে চারহাজার নিয়েছে। পরে গুলগাপ্পি মেরে আরও আটহাজার নেবে।

--- প্রথমটা ঠিক। পরেরটা জানি না। কিন্তু আপনি--- ?

--- কী করে জানলাম। গুঁতো দিয়ে কে কতো ঝাড়লো, সে আমরা জানতে পারি। ওর জটিল কেসগুলো আমিই লড়ি। কেন, বলেনি একজন সিনিয়রকে দাঁড় করাতে হবে? আমিই সওয়াল করি। আমার কাছে সরাসরি এলে এর অর্ধেক খরচে হয়ে যেতো। এখন ও আপনার জন্য একটা উকিলের চিঠি টাইপ করাচ্ছে। বয়ানটা আমার।

ভদ্রলোক মুহূর্তে অন্তর্হিত হলেন।

মল্লিক এলেন।

--- আরে ওই টাউটটা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল দেখলাম। তোমার কাছে আসেনি তো ?

--- এসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় বাড়ি। তারপর চলে গেলেন।

--- খুব সাবধান। কোর্টে কক্ষনো নিজের উকিল ছাড়া কথাই বলবে না।

--- স্যার, আমি আপনাকেই ধরে আছি।

—শোন, তোমার স্কুলে একটা চিঠি দিচ্ছি। মানে একটা আন-ল-ফুল কাজের জন্য একটা ল-ফুল চিঠি। বেশ গুছিয়ে ড্রাফট্ করেছি। তুমি একটা কপি রাখতে পারো। চলো এবার ওঠা যাক।

দুজনে বাইরে এলো। কল্যাণ না বললেও পারতো। তবুও হৃদয়হীনতার পরিমিতি দেখার জন্য বলেই ফেললো --- চলুন স্যার, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মল্লিকের চোখে মুখে লালসা গর্জন করে উঠলো, --- তুমি আবার যাবে? এই ভদ্রতাগুলো দেখাই যায় না, জানো? ওই ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করাও। কল্যাণ আদালত চত্বরটাকে এক নিশ্চল সেলাম জানিয়ে গাড়িতে উঠলো।

ট্রেনটা একটা স্টেশনে দাঁড়ালো। কিছু লোকজন ওঠা নামা করলো। বিচিত্র এই জগৎ। মানুষ অস্তিত্ব রাখার জন্য কত কীই না করে ! কল্যাণ যখন ছোট ছিলো তখন বাবা একটা কেস নিয়ে বিব্রত ছিলেন। সদর থেকে উকিল এসেছিলেন একবার তাদের গ্রামের বাড়িতে। তাঁকে কী যত্ন, কী তোয়াজই না করা হয়েছিল। তাঁকে দেখে তারও সাধ হয়েছিল পারলে সে ওকালতি পড়বে। ন্যায়ের জন্য লড়বে। আজ সেই উকিলবাবুদের উঞ্ছবৃত্তি দেখে তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। তার খুব হাসি পেলো। এরা না কী প্রফেশনাল! প্রফেশনালিজমের কী অপূর্ব নমুনা! তবুও সবাই আমরা এই ব্যবস্থারই দাস। অল্পে কেউ সন্তুষ্ট নই। আরো চাই, আরো চাই করে মানুষ সন্তুষ্টি ভুলে গেছে। এই সব কথাগুলো সুজাতাকে না বলা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছে না। আর অভিমন্যু সমাচার তো দিতেই হবে। ভদ্রলোক বেশ ইন্টারেস্টিং !

গাড়িটা ছাড়লো। সুজাতা এখন কী করছে কে জানে? তারই পথ চেয়ে বসে আছে নিশ্চয়ই। সে কোনদিন ভাবেই নি সুজাতা তার স্ত্রী হবে। সেই কবে অর্জুন আর সুজাতা তার সহপাঠী আর সহপাঠিনী ছিলো বি এ পড়ার সময়। অর্জুন সুজাতার দাদা। ওরা একসঙ্গে একই ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলো। অর্জুনের সঙ্গেই প্রথম ভাব হয়েছিলো। অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোতে সে তেমন পটু ছিলো না। হলোই বা সে ক্লাসমেট। তার আর অর্জুনের আড্ডাতে সুজাতাও যোগ দিতো। গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা কলেজের স্যারদের নিয়ে মজা করা, আবার পড়াশুনোও। কিন্তু প্রেমের কথা কোনদিন ভাবেও

নি, ভাবার প্রশ্নই ছিলো না। কথা প্রসঙ্গে সে শুনে ফেলেছে ওদের বাড়ির মানসিক অবস্থান। হীনমন্যতা না থাকলেও একটু দূরত্বই বজায় রাখতো। এইভাবে দিন কাটে। সুজাতার বালিকাসুলভ চপলতা, কথা, যুক্তি তার ভালোই লাগতো। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মনকে শাসনে রাখতো। একদিন কলেজের পাশে একটু ছোট্ট জঙ্গলে একটি গাছের তলায় তাদের গল্প সন্ধ্যা পর্যন্ত গড়িয়েছিলো।

গ্রামীন শাসনে গ্রাম সভার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছিলো। বেশিরভাগই গ্রামসভার পক্ষে ছিলো, সুজাতা আর ক্যলাণ ছিলো বিপক্ষে। ওদের যুক্তি ছিলো পশ্চিমি ধাঁচের শাসন ব্যবস্থায় গ্রামসভার প্রয়োজনীয়তা তখনই যখন তা নিরপেক্ষ লোকজন নিয়ে গঠন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে তা হবার যো নাই। থিওরেটিক্যালি নিরপেক্ষ বলে দাবি করা হলেও প্রতিটি গ্রামসভাই রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট। অতএব তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। অনিবার্যভাবে মীমাংসার আশু সম্ভাবনা না থাকায় অর্জুন বলে উঠলো, —তিপু একটা গান শোনা না। অনেক দিন তুই গান শোনাসনি। সুজাতা হাঁটু মুড়ে থুতনি চেপে বসে ছিলো। দাদার দিকে একবার সুজাতা মুখ ভ্যাঙালো। সকলে মজা পেয়ে হেসে উঠলো। তারপর গ ান ধরলো অনেক দিন বাদে।

-- দ্ধ দুয়ার খুললো বুঝি, দ্বিধার বাসর ছেড়ে --
কুণ্ঠা এসে চরণদুটির চলনটা নেয় কেড়ে।
আজকে মনের আগল তুমি
ব্যাকুল বেগে গেলো খুলি।
ঝড়ের শাসন পথের বাঁধন সজোরে দেয় নেড়ে।
আমরা শুধু সহজ কথা উল্টো করে ভাবি,
প্রহরগুনি শতেক খানেক তবেই জলে নাবি।
পাবার যদি থাকেই তৃষা
আয়না চলে পুলক মিশা,
আনন্দেরই ভাগ দিয়ে যায় ওই যে অস্ত রবি।

সবাই চুপচাপ। কল্যাণ মুগ্ধ, বাক্‌রহিত। তবু সেই দিনই সেই সন্ধ্যাবাসরে সেই প্রথম যে যেন সুজাতার নম্র চাহনিতে এক অচেনা শিহরণ অনুভব করেছিলো।

ট্রেন এখন তুমুল বিক্রমে দৌড়চ্ছে।

ক্রমশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

লীনা চক্রবর্তী
বিমল ভুঁইয়া
অঞ্জলি চ্যাটার্জি
ইরা হালদার
বিশ্বেশ্বর কুন্ডু
গৌরাঙ্গ গোপাল মিত্র